দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 APR 1988
পৃষ্ঠা 3

036

শিক্ষাঙ্গনে প্রত্যাখ্যানের পালা

কি একটা গান ছিল না—'তুমি ফিরায়ে দিয়েছ বলে, ফিরে চলে যাই—চলে যাই....'? গানটা অনেকের প্রিয় ছিল। দুঃখের গান আমাদের প্রিয় হয়, কিন্তু দুঃখ প্রিয় হয় না। যদিও নিজের দুঃখ এবং পরের দুঃখ কোনদিনই এক ব্যাপার নয়। নিজের দুঃখ যতটা অপ্রিয়, পরের দুঃখ তেমন নাও হতে পারে। পরের দুঃখ উপেক্ষা করা সম্ভব, মাঝে মাঝে তা বাড়িয়ে তোলাও যায়। তাই, যা বলছিলাম, ফিরিয়ে দেবার গানটি বেশ। ফিরিয়ে দেবার কাজটি যিনি ফিরিয়ে দেন তার জন্যে খুব মন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু যিনি ফিরে চলে যান তার কাছে অভিজ্ঞতাটা তিক্ত। বিরস।

সারাদেশে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে এখন ওই ফিরিয়ে দেবার এবং ফিরে চলে যাবার নাটক অভিনীত হচ্ছে। বিয়োগান্ত নাটক। আবার কারো কারো কথা চিন্তা করলে মিলনান্তও বলা যায়। পৃথিবীর কোন ঘটনাই সবার জন্যে সমান নয়। পৌষ মাস আর সর্বনাশ মিলেমিশে থাকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর দিয়েছেন দৈনিক বাংলার সংবাদদাতা। ভর্তির খবর। কিংবা ওই ফিরিয়ে দেয়া ও ফিরে চলে যাবার খবরও বলা যায়। এখনো যায়নি। যাবে। তার আয়োজন শুরু হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে দুই হাজার আটশ ছিয়াশিটি আসন আছে। আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে ১৩ হাজার ৭৯৬টি। অর্থাৎ প্রায় ১১ হাজার ছাত্র ফিরে যাবে। তেমন বেশী নয় অবশ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে গেছে ২৬ হাজার। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন হাজার। এখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্স্ট। অন্য সবাইকে বিট দিয়ে দিয়েছে। হার্ড কম্পিটিশন। প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা, আভিজাত্য অনেক কিছু যাচাই হয়ে যায় এই প্রতিযোগিতায়।

ব্যবসায়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও ঘটনাটা উৎসাহব্যাঞ্জক। ছাব্বিশ শতাংশ শিক্ষিতের দেশে শিক্ষা নিয়ে দারুণ লাভজনক বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। সিটের সংখ্যা কম, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হলে সব কিছুর দাম বাড়ে। অর্থনীতির সেই পুরোনো নিয়মে চড়া দামে এখন ভর্তির ফরম

কণিকা সাহফুজ

বিক্রি হচ্ছে। লাখ টাকা আয় হচ্ছে। ব্যবসাবুদ্ধি উন্নতির লক্ষণ। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ আর ইংরাজ বেনিয়ারা এক সময় বাণিজ্য করতে গিয়েই তো দুনিয়া জয় করতে বসেছিল। ওসব দুনিয়াজোড়া কারবারে অবশ্য আমরা কখনো নেই। আমাদের শোষণ-তোষণ সবই নিজের ঘরে।

তা শিক্ষা নিয়ে যে এমন লাভজনক ব্যবসা করা যাচ্ছে তার থেকেই কিন্তু প্রমাণ হয় যে শিক্ষাপ্রীতির সত্যিই প্রসার হয়েছে। শিক্ষার পেছনে আজকাল অনেকেই দেদার পয়সা খরচ করেন দেখা গেছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালা হয় প্রাইভেট টিউটরের পেছনেই। বিশ-তিরিশ বছর আগে এমনটা ভাবাই যেত না। উচ্চশিক্ষাঙ্গনেও এত শিক্ষার্থীর ভিড় জমত না। শিক্ষিতের হার আলু-পটলের দামের মত দুম্দার করে বেড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তবে পরিসংখ্যানে এখনো তেমন বেশী নয়। ছাব্বিশ শতাংশের হিসাবটা সাক্ষরতার। নাম সই করতে পারলে, চিঠি লিখতে ও পড়তে পারলেই ওই হিসাবে শিক্ষিত। জনসংখ্যার শতাংশে হিসাব কষলে উচ্চশিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত যারা পৌঁছায় তাদের সংখ্যা খুব কম। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেই তো প্রচুর কাটছাঁট হয়ে যায়। তারপর হতেই থাকে। কেউ ক্লাস ফোর ফাইভে, কেউবা এইটে। কেউ এসএসসিতে এসে ঠেকে যায়। এত সব বেড়া ডিঙিয়ে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত আর ক'জনই বা আসতে পারে? খুব কমই নিশ্চয়? আবার কমও কি সত্যিই? এই ভর্তির মরশুমে উচ্চশিক্ষাঙ্গন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শিক্ষার্থীদের ফিরে যেতে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে—বেশী। অন্তত আমরা যা আশা করেছিলাম, অথবা যতখানির জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম তার থেকে অনেক অনেক বেশী। এত বেশী উচ্চশিক্ষার্থী সত্যিই কাম্য কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন মনে হচ্ছে।

শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার সংকল্প আমাদের আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি তেমন কোনো ঘটনা যদি কখনো ঘটেই যায় তার হ্যাপা সামলাতে জান বেরিয়ে যাবে যে। বড় অঘটন হবে সেটা। ছাব্বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত সাক্ষরতা। তারপর বড়জোর দশ শতাংশ উচ্চশিক্ষা। এর বেশী শিক্ষার আয়োজনই তো নেই আমাদের। শিক্ষার প্রসারের কথা বলতে বেশ লাগে, সন্দেহ নেই। বেশ উদ্দীপনা এসে যায়। কিন্তু ওকথায় বেশী বিশ্বাস করতে গেলেই ফ্যাসাদ।